ইউনিট ৭

ব্যবসায় আইনের বিভিন্ন দিক ও সফল উদ্যোক্তাদের কেস স্টাডি

(Legal Aspects of Business and Case Study of Successful Entrepreneurs)

ভূমিকা (Introduction)

সাধারণ অর্থে আইন হলো এমন কতগুলো নিয়মকানুন বা বিধি-বিধান, যা সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবন যাত্রাকে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং সুশৃংঙ্খলভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যবসায় বানিজ্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত ও চিন্তা করার জন্য প্রয়োজন হলো ব্যবসায় আইন। ব্যবসায় বা বানিজ্যিক আইন হলো এমন আইন, যার অধীনে দেশের ব্যবসায় বানিজ্য ভালভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় যথা- একমালিকানা, অংশীদারী, যৌথমূলধনী, সমবায় প্রভৃতি চালু আছে। যদি ইচ্ছে মতো সবাই ব্যবসায় করে তবে অবশ্যই বিঘ্নিত হবে ব্যবসায় কার্যক্রম। রক্ষা করা সম্ভব হবে না মালিক-শ্রমিক ভোক্তা কারো স্বার্থ। তাই একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হলে কিংবা একজন ব্যবসায়ের শিক্ষার্থী হিসেবে অবশ্যই ব্যবসায় আইনের নানা দিক জানতে হবে। শুধু ব্যবসায়ের আইনই নয় পাশাপাশি ব্যবসায়ের জগতে সফরতা লাভ করার জন্য বিভিন্ন সফল উদ্দ্যোক্তাদের জীবনী নিয়ে নানান কেস্ স্টাডি আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে কেস্ স্টাডি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা রাখতে হবে। কারন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেস্ স্টাডি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আজকের যে কেস্ স্টাডি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তার উৎপত্তি হয়েছে ৮০ বছর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর সফলতার ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় কেস্ স্টাডি পদ্ধতি ১৯৭১ সালের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে আমাদের দেশের প্রায় সকল শিক্ষা কার্যক্রমে কেস্ স্টাডি পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাঠ-১ ঃ ব্যবসায় আইনের সংজ্ঞা, আইনের উৎস ও ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত আইন
(Definition of Business Law, Sources of Business Law and Acts related to Business or Business Law)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের আইনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ব্যবসায় আইনের উৎসগুলো বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন ব্যবসায় আইনের শাখাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবসায় আইনের সংজ্ঞা (Definition of Business Law)

অতি সাধারণ ভাবে বলা যায়, যে আইনের যে দিক বা শাখা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যবহার করা বা অনুসরণ করা হয়, তাকে ব্যবসায় আইন বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে আইনের অধিনে দেশের ব্যবসায়-বানিজ্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ব্যবসায় আইন। কারো মতে ব্যবসায় সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা যে আইনের দ্বারা নিস্পত্তি করা হয় তাকেই ব্যবসায় বা বানিজ্যিক আইন বলে।

সর্বশেষে বলা যায়, ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন লেনদেন এবং লেনদেন হতে সৃষ্ট সমস্যাদি নিয়ন্ত্রন ও নিস্পতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান বা নিয়মকে ব্যবসায় বা বানিজ্যিক আইন বলে।

বাংলাদেশের ব্যবসায় আইনের উৎস (Sources of Business Law in Bangladesh)

অতিপ্রাচীন কাল হতেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ রীতি নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় লেনদেন সমূহ নিয়ন্ত্রীত হতো। পরবর্তীতে বৃটিশদের শাসনামলে ব্যবসায় বানিজ্যের ক্ষেত্রে এই উপমহাদেশে বৃটিশ আইন যুক্ত হয়। তাই অদ্যবধি এই উপমহাদেশের ব্যবসায় বানিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজী আইনের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ব্যবসায়-বানিজ্যে যে সমস্ত আইনের উৎসমূহ প্রচলিত রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। বিধিবদ্ধ আইন (Statutory Law) :ব্যবসায় আইনের অন্যতম উৎস হলো বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রনীত আইনসমূহ।

২। ইংরেজী সাধারণ/ কমন আইন (English Common Law): ইংরেজী কমন “ল” হলো বাংলাদেশের ব্যবসায় আইনের অন্যতম উৎস। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন সমূহ কোন সমাধান দিতে পারেনা, সে সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ ইংরেজী কমন ‘ল’ এর সাহায্য নেন ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেন।

৩। স্থানীয় নীতি ও প্রথা (Local Usages and Customs) : বাংলাদেশে ব্যবসায় আইনের অন্যতম একটি উৎস হলো স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রথা। যদি কোন স্থানীয় রীতিও প্রথা ব্যবসায়-বানিজ্যর সাথে বিতর্কিত না হয় তাহলে রীতি ও প্রথা ব্যবসায় আইনের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়।

৪। ন্যায়নীতি (Equity) : বাংলাদেশের যে সকল ব্যবসায়ীক সমস্যা স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রথা বা অন্যকোন আইন দ্বারা সমাধান না হয় সে সমস্ত ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ ন্যায়নীতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তসমূহই পরবর্তিতে ব্যবসায় আইনের উৎস হিসেবে গণ্য হয়।

ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত আইন/ ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইন (Acts Related to Business/ Business Law)

বর্তমান ব্যবসায় জগতে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় পরিচালনা সম্পর্কিত নানা বিধি-বিধান বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ব্যবসায়-বানিজ্য সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা নিয়ন্ত্রন, চুক্তিসম্পাদনের জন্য ব্যবসায়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের ব্যবসায়ের সাথে সর্ম্পকিত বিভিন্ন আইন সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ব্যবসায়ের সাথে সর্ম্পকিত নানান আইন সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১। **চুক্তি আইন (Laws of Contract) :** ব্যবসায় বানিজ্য ভাল ভাবে পরিচালনা করার জন্য চুক্তি একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট কতগুলো শর্তপূরণ সাপেক্ষে যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে চুক্তির বা সম্মতি বলে। বাংলাদেশে বলবৎ যোগ্য ১৮৭২ সালের ২ এর (এইচ) ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য সম্মতি হলো চুক্তি। ব্যবসায় বানিজ্য বা যে কোন ক্ষেত্রে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হলে চুক্তির দুটি আবশ্যকীয় উপাদান অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। এগুলো হলো- (ক) চুক্তিতে একটি সম্মতি থাকবে। ও (খ) ঐ সম্মতি আইন কর্তৃক বলবৎ যোগ্য হবে।

২। **পণ্য বিক্রয় আইন (The sale of Goods Acts) :** বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে পণ্য বিক্রয় আইন জানতে হবে। এই আইন সম্পর্কে অবহিত থাকলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত থাকতে পারবে। আমাদের দেশে পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হয় ১৯৩০ সালের পণ্য বিক্রয় আইন দ্বারা। যা ঐ একই বছরের ১লা জুলাই হতে কার্যকরি হয়।

৩। **অংশীদারী আইন (Partnership Act) :** অংশীদারী ব্যবসায় একটি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যবসায়। এব্যবসায়টি সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক অংশীদারকে অংশীদারী আইন সম্পর্কে জানতে হবে। প্রথমদিকে ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারী আইন অনুযায়ী অংশীদারী কারবার পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে ১৯৩২ সালে ভারতীয় অংশীদারী আইনটি ১৯৪৭ সালে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্থানে অংশীদারী আইন হিসেবে গৃহীত হয় পুনরায় ১৯৭২ সালে ঐ আইনটি স্বাধীন বাংলাদেশের অংশীদারী আইন হিসেবে হুবস্থ গৃহীত হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হতে তা সারা বাংলাদেশে বলবৎ হবে বলে ঘোষনা দেওয়া হয়।

৪। **বীমা আইন (Insurance Law) :** বর্তমান ব্যবসায়ে জগতে বীমা একটি গরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ে ক্ষেত্র হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। মানুষ সব সময় নিজেদের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা হতে দুরে রাখতে চায়। আর এ জন্যই সৃষ্টি হয়েছে বীমা ব্যবসায়ের। ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম এ উপমহাদেশে বীমা ব্যবস্থাকে আইনগত দিক থেকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই ১৯৩৮ সালে বীমা আইন দ্বারাই বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায়ের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে “কোম্পানি আইন ১৯৯৪” প্রচলিত আছে।

৫। **কোম্পানী আইন (Company Law):** বৃহদায়তন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হলো কোম্পানী ব্যবসায়। বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনটি ১৯১৪ সালের ১লা এপ্রিল হতে এ উপমহাদেশে কার্যকর হয়। পরিবর্তিতে কিছু সংশোধনী করে ১৯৭৩ সালে ঐ আইনটি বাংলাদেশের কোম্পানী আইন হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৬১ সালে গঠিত কোম্পানী আইন কমিশন ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ব্যাপক পরিবর্তন ও সংশোধনের সুপারিশ করলেও তা কার্যকর হয়নি। বর্তমানে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের স্থলে বাংলাদেশে নতুন একটি কোম্পানী আইন প্রাণয়নের কাজ চলছে।

৬। **কারখানা আইন (Factory Act) :** কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজের সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নততর কাজের পরিবেশ ইত্যাদি নিশ্চয়তা বিধান কল্পে প্রবর্তন করা হয় কারখানা আইন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান কারখানা আইন ১৯৬৫ কে সামান্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশে কারখানা আইন ১৯৬৫ নামে হুবহু গ্রহণ করা হয়। পরবর্তিতে বিভিন্ন সময়ে আইনটির বিভিন্ন ধারার সংশোধন করা হয়েছে।

৭। **শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (Labor Compensation Act) :** উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা পতিত হয় বিভিন্ন রকম বিপদের, এমনকি মুত্যু পর্যন্ত ও ঘটে থাকে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের মূল কথা হলো শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করতে যেয়ে বা কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে কোন দৃঘটনায় আহত বা নিহত হলে তাদেরকে মালিক আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেবে। আমাদের দেশে এ আইন ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন নামে পরিচিত। যদিও বিভিন্ন সময়ে কিছু সংশোধনি আনা হয়েছে।

৮। **মুজুরি পরিশোধ আইন (Payment of Wages Act) :** শ্রমিকরা তাদের কাজের বিনিময়ে যা পেয়ে থাকে তাই হলো মজুরী। এ মজুরী সম্পর্কে শ্রকিক ও মালিক পক্ষ সবসময় ভিন্ন ধারনা পোষন করে। ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় নানান সমস্যা। এরুপ সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কলকারখানায় মজুরী পরিশোধের বিভিন্ন নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন, সময়ানুপাতিক মজুরি, কার্যনুপাতিক মজুরি ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে প্রথমবারের মতো

এ উপমাহাদেশে মজুরী পরিশোধ আইন প্রবর্তন করা হয় এবং বর্তমানে এ আইনটিই সংশোধিত আকারে আমাদের দেশে চালু আছে।

৯। **শ্রমিক নিয়োগ আইন (The Employment of Labur Act):** ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম দোকান, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পে চাকুরিরত শ্রমিকদের চাকুরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে প্রনীত হয় শ্রমিক নিয়োগ আইন। ১৬৯৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনটি বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় না। এ আইন দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পে চাকুরিরত শ্রমিক কর্মচারিদের চাকুরীতে নিয়োগ, ছুটি, অপসারণ, ছাঁটাই, জরিমানা, লে-অফ, ধীরে কাজ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্র করে।

১০। **দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন (The Shops and Establishment Act):** ব্যবসায় বানিজ্যের ক্ষেত্রে দোকান ও প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এদের কার্যাবলীকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রবর্তিত হয় ১৯৬০ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৩ সালের ৮নং আইন এবং ১৯৭৪ সালের ৫৩ নং আইন দ্বারা ঐ আইনের কতিপয় সংশোধনী করা হয়। বর্তমানে ১৯৬৫ সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনটি সংশোধিত আকারে এদেশে চালু রয়েছে।

১১। **সমবায় সমিতি আইন (Law of Co-operative Societies) :** সমবায়কে অধিকতর সুসংগঠিত ও ফলপ্রসু করার জন্য এ উপ-মহাদেশের তৎকালীন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এর খ্যাতনামা সদস্য মিঃ ফ্রেডারিক নিকলসন এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে ভারতে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি আইন পাশ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪০ সালে আবার নতুন সমবায় আইন পাশ করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর সরকারের সমবায় সমিতি আইন ১৯৪০ ও সমবায় সমিতি বিধি ১৯৪২ সংশোধন করে যথাক্রমে সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ (অধ্যাদেশ নং ১,১৯৮৫) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ১৯৮৭ দ্বারা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

১২ । **মুল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ (Value Added Tax Act-1991) :** সরকার কর কাঠামো আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে দ্বৈত করের অবসান ঘটিয়ে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ প্রবর্তন করেছে। মূল্য সংযোজন করের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই করের প্রায় সকল পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। এই করে ব্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য সকল পণ্য বা সেবার জন্য মাত্র একটি হার নির্ধারিত থাকে। মূল্য সংযোজন কর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করে না। যে সব শিল্পোদ্যোক্তা উৎপাদনমূলক বা সেবাদান ব্যবসায় নিয়োজিত তাদের সবাইকে মূল্য সংযোজন করের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং পরিশোধ করা উচিত। এই কর কাঠামোর আওতায় নিবন্ধিত সকল করদাতাকে শতকরা ১৫ ভাগ হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদান করতে হয়। পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্ন ওভারের পরিসীমা পাঁচ লাখ টাকা হলে মূল্য সংযোজন কর দিতে হয়। তবে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্ল্যান্ট মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট বিনিয়োগকৃত মূলধন বছরের যে কোন সময় তিন লক্ষ টাকার অধিক হবে না, সে সব প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট প্রদান থেকে রেয়াত দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনমূলক ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর ভ্যাট রেয়াত গ্রহণের বিধান রয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন করের আওতায় পরে এদেরকে জাতীয় রাজস্ববোর্ডে নিবন্ধিত হতে হবে এবং এই কর শুল্ক ও আবগারী দপ্তরে প্রদান করতে হবে।

১৩ । **আয়কর আইন (Income Tax Act) :**যে কোন দেশের সরকারের আয়ের একটি প্রধান উৎস আয়কর। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় একটি নির্দিষ্ট অংকের চেয়ে বেশি হলে আয়কর আইন অনুযায়ী আয়কর প্রদান অপরিহার্য্য । ফলে ব্যক্তি,ফার্ম ও কোম্পানির আয় করযোগ্য হলে কর প্রদান নৈতিক ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকে। আয়কর প্রদানকারী ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দাবিদার হতে পারে। আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আয়কর আইন অনুযায়ী আয়ের উপর কর অব্যাহতি পায়।

সকল শিল্পোদ্যোক্তার আয়কর আইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ কর নির্ধারণের বেলায় কী কী খাতে আয়কর রেয়াত পাওয়া যায় তা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আয়করের সিঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সহায়ক হয়। সুষ্ঠুভাবে আয়কর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে একদিকে অপেক্ষাকৃত কম আয়কর প্রদান অন্যদিকে বিনিয়োগের মাত্রা বাড়ানো সম্ভব। আয়কর আইন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলে আয়কর অফিসার বা আয়কর পরামর্শদাতার সঙ্গে যুক্তিযুক্তভাবে কথা বলা সম্ভব হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

সাধারণ অর্থে আইন হলো এমন কতগুলো বিধি বিধান যা সমাজে বসবাসরত মানুষের জীবন যাত্রাকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যবসায় আইন হলো এমন আইন যার অধিনে ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যবসায় আইনের নানান উৎস রয়েছে। যেমন- বিধিবদ্ধ আইন কমন আইন ইত্যাদি।

ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে নানান আইন। এগুলো হলো চুক্তি আইন, অংশীদারী আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন, শ্রমিক ক্ষতিপুরণ আইন, বিক্রয় আইন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যবসায় আইনের উৎসগুলো বর্ণনা করুন।

২। ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ব্যবসায় আইনের সংজ্ঞা দিন।

২। অংশীদারী আইন সম্পর্কে কি জানেন?

৩। মূল্য সংযোজন কর কি?

৪। মজুরি পরিশোধ আইন কেন চালু হয়েছে?

পাঠ-২ ঃ কেস্ স্টাডির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা (Meaning, Objectives and Importance of Case Study)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কেস্ ও কেস্ স্টাডির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- কেস্ স্টাডির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- কেস্ স্টাডির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

কেস্ ও কেস্ স্টাডির সংজ্ঞা (Definition of Case and Case Study)

কেস্ হলো ঘটনা প্রবাহের ক্রমধারা ভিত্তিক বর্ণনা বিশেষ। অন্যভাবে বলা যায় যে, কেস্ হলো একজন প্রশাসক বাস্তবে যে পরিস্থিতি বা সমস্যার সম্মুখীন হন তার একটি বিবরণ, যার বিশ্লেষনের মাধ্যমে একটি সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ হয়ে পরে অপরিহার্য।

ব্যবসায় কেস্ হলো বাস্তব জীবন ভিত্তিক পরিস্থিতির একটি সুসংবদ্ধ রূপরেখা যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে। এই ধরনের কেস্ একজন গবেষক কোন একটি কোম্পানীর বা ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন রকম তথ্যাবলী, পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে জড়িত ঘটনাবলী সংগ্রহ করে এমন একটি বিষয় দাঁড় করান যার দ্বারা পাঠকরা সংঘটিত ঘটনা মনের আয়নায় অবলোকন করে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। এবারে আসা যাক কেস্ স্টাডি সম্পর্কে কেস স্টাডি হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা বা আলোচনা যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, কেস্ স্টাডি হলো বাস্তব পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করে একজন ব্যক্তি সফল বা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেখান হতে কি শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা নিয়েই আলোচনা করে।

কেস স্টাডির মাধ্যমে একজন সম্ভাব্য ব্যবসায়ী বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেকে সফল উদ্দ্যোক্তা হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। সর্বশেষে এটাই বলা যায় যে, কেস স্টাডি হলো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এমন একটি অত্যাধুনিক রুপ যার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সফল বা ব্যর্থ উদ্দ্যেক্তাদের জীবনী পর্যালোচনা করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

কেস্ স্টাডির উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of Case Study)

আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে যে কেস স্টাডি পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল তার পিছনে ছিল কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। কেস্ স্টাডির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ছাত্র/ছাত্রী বা শিক্ষার্থীদেরকে ব্যবসায় জগতে উদ্ভুত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, ঘটনাবলী, পরিস্থিতি, বিরোধ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিপাদনের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা। এছাড়া কেস্ স্ট্যাডির সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে নিম্নরূপ আলোচনা করা যায় ঃ

১। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ (Learning from experience) :কথায় আছে অভিজ্ঞতার কোনই বিকল্প নেই। কেস্ স্টাডির প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। একজন শিক্ষার্থী তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি অভিজ্ঞতায় ভরপুর ব্যক্তিবর্গের জীবনী বা কেস্ আলোচনার দ্বারা অভিজ্ঞাতা অর্জন করতে পারে।

২। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা (Aid to decision making) সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সময় প্রয়োজন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারনা। এজন্য নতুন উদ্দ্যেক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায্য করার উদ্দেশ্যে কেস পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়।

৩। বিচার শক্তি বৃদ্ধি (Increasing Judging capacity) কেস স্টাডির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নিজেই বিচার বিবেচনা শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে।

৪। সঠিক নীতিমালা তৈরী (Preparing right policies) : কেস স্টাডির মাধ্যমে কোন একজন উদ্যেক্তা কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তব সম্মত তথ্য পেতে পারে, ফলে তার পক্ষে সঠিক নীতিমালা তৈরী করা সম্ভব হয়।

৫। প্রায়োগিক শিক্ষা (Promotive education) তাত্ত্বিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষাদান বর্তমানে সরাবিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয়। এজন্য শিক্ষাথীকে প্রয়োগিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা কেস্ পদ্ধতি অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

৬। বাস্তব অবস্থা পরিবেশন (Presenting real condition) সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য প্রয়োজন বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারনা। তাই কেস্ স্টাডির মাধ্যমে সম্ভাব্য ও নতুন উদ্যেক্তাদের অবস্থা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা যায়।

৭। দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহ (Creating attitude to group decision) যে কোন কার্য সঠিক বা সফলভাবে সম্পাদনের পূর্বশর্ত হলো দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কেস্ স্টাডির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী হয় যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তব সম্মত হয়।

কেস্ স্টাডির প্রয়োজনীয়তা (Importance of Case Study)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কেস্ স্টাডি একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গতানুগতিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব সম্মত জ্ঞান অর্জন করতে পারে। নিম্নে কেস্ স্টাডির গুরুত্ব বা প্রয়োজনীতার আলোচান করা হলোঃ

১। শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি (Modern method of teaching) : আধুনিক সময়ে শিক্ষাদানের একটি অন্যতম সফল পদ্ধতি হলো কেস্ স্টাডি তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি এ পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

২। গবেষনায় উদ্বুদ্ধকরণ (Pursuing in research): কেস্ স্টাডি হলো মূলত একটি গবেষণা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সফল বা ব্যর্থ বিভিন্ন উদ্যোক্তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা তা বিশ্লেষন করে গবেষানা কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়।

৩। জটিল সমস্যার সামাধান (Solving complex problems): কেস্ স্টাডির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, এর মাধ্যমে অতি সম্বন্ধে জটিল সমস্যার সমাধান করা যায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কি কি সমস্যা আসতে পারে, এর পূর্বে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে কেস স্টাডির মাধ্যমে পূর্ব থেকেই বোঝা যায়, ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৪। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন (Implementation of plan) : পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেস্ স্টাডির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত তথ্যের প্রয়োজন তা কেস স্টাডি সহজেই পাওয়া যায় ফলে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৫। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ (Learing through experience) : একজন নতুন উদ্যেক্তা কেস্ স্টাডির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। ফলে সে অনুযায়ী সে তার ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

কেস্ স্টাডি হলো বর্তমান ব্যবস্থায় এমন একটি অত্যাধুনিক রুপ যার দ্বারা একজন শিক্ষার্থী সফল বা ব্যর্থ উদ্যোক্তাদের জীবনী পর্যালোচনা করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কেস স্টাডি করা হয। এগুলো হলো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ, সিদ্ধান্তগুলো সহায়তা বিচার শক্তি বৃদ্ধি, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহ ইত্যাদি। কেস স্টাডি নানান প্রয়োজনে পরিলক্ষিত হয়, যেমন, গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করণে, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, জটিল সমস্যা সমাধানে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কেস্ স্টাডি কি? কেস্ স্টাডির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। কেস্ স্টাডির উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কেস্ কি;
২। কেস্ স্টাডির সংজ্ঞা দিন।
৩। কি উদ্দেশ্যে কেস্ স্টাডি করা হয়।

পাঠ-৩ ঃ কয়েকজন সফল ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার জীবনী
(Lives of Successful Businessman or Entrepreneurs)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- এ দেশের কয়েকজন সফল ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

জনাব আবুল কাশেম খান

চট্রগামের মোহরা গ্রাম। এই গ্রামে ১৯০৫ সালের ৫ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন এদেশের বিশিস্ট ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি জনাব আবুল কাশেম খান। যিনি এ,কে, খান নামেই সমধিক পরিচিত। আবুল কাশেমকে ঘিরে ছিল পিতা মাতার সীমাহীন স্নেহ এবং অপরিসীম ভালবাসা, পিতা আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ খান ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, মিষ্টভাষী একজন প্রিয় ব্যক্তি। কথিত আছে তাঁর পূর্ব পুরুষ হামজা খানের পৈতৃক নিবাস ছিল গৌড়ে।

সাব-রেজিষ্ট্রার জনাব আবদুল লতিফ খানের কর্মস্থল ছিল চট্রগ্রামের ফতেয়াবাদ গ্রামে। আবুল কাশেমের মা বেশীর ভাগ সময় মোহরায় থাকতেন। ফতেয়াবাদে পিতার সান্নিধ্যেই আবুল কাশেমের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। ফলে পিতার প্রভাব তাঁর চরিত্রের উপর বেশী পড়ে।

আবুল কাশেম ফতোয়াবাদে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন এবং পরে ফতেয়াবাদ হাই স্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উর্ত্তীণ হন। চট্রগ্রাম সরকারী কলেজ হতে তিনি আই,এ,পাশ করেন। এরপর তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানকার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন।

১৯২৭ সালে তিনি এ কলেজ হতে কৃতিত্বের সাথে ইংরেজীতে অনার্স সহ বি,এ, পাশ করেন। বাল্যকাল হতে আবুল কাশেমের আইনজ্ঞ হবার বাসনা ছিল। তাই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন কলেজ আইন পড়া শুরু করেন এবং ১৯৩৩ সালে বি, এল, ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। লেখা পড়া শেষ করে ১৯৩৩ সালে আবুল কাশেম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কলকাতা হাইকোর্টে উকিল হিসাবে দুই বছর পরে তাঁর পিতা অবসর গ্রহণ করেন। পিতার সুযোগ্য সন্তান এ, কে, খান, পরিবারের হাল ধরার জন্য মুন্সেফের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৫ হতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত আট বৎসর সময়কাল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুন্সেফ হিসাবে কাজ করেন।

১৯৩৩ সালে আবুল কাশেম খান বিবাহ করেন বার্মার ব্যাবসারত চট্রগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি জনাব আবদুল বারী চৌধুরীর কন্যাকে। আবদুল বারী চৌধুরী ছিলেন তাঁর কাজের এক প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব। বার্মায় তাঁর চাউলের কল ছিল এবং তিনি ছিলেন তখনকার দিনের অন্যতম নামকরা বেঙ্গল বার্মা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

এ,কে, খান যখন বিবাহ করেন তখন তিনি হাইর্কোটের এড্ভোকেট। পরে বরিশাল থাকা কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে জাপানীদের হাতে বার্মার পতন অত্যাসন্ন মনে হতে লাগলো। জনাব আবদুল বারী চৌধুরী তাঁর রেঙ্গুনের বিরাট ব্যবসায় চট্রগ্রামে নিয়ে আসেন। আবদুল বারী চৌধুরীর ছেলেরা তখনও ছোট।

এই কারণেই তিনি তাঁর জামাতা এ,কে, খানকে ব্যবসায় নেমে পড়তে অনুরোধ করলেন। চৌধুরী সাহেব বেঙ্গুনে তাঁর সম্পত্তির সিংহ ভাগই ফেলে এসেছিলেন। মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা তিনি সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি জামাতাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এ,কে, খান জীবনে ব্যবসায় করবেন এমন স্বপ্ন কখনও দেখেননি। কিন্তু জীবনের এই ক্ষণে শ্বশুরের সান্নিধ্য, ব্যবসার প্রস্তাব এবং মূলধনের প্রতিশ্রুতি তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখেন যে, তিনিই পরিবারের বড় ছেলে, পিতা অবসর জীবনযাপন করছেন। সুতরাং ব্যবসায় নেমে পড়লে পরিবারের আরও হয়তো কিছু স্বচ্ছলতা আসবে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি শ্বশুরের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আজ আমরা যে এ, কে, খানকে চিনি, তাঁর জীবনে তাঁর শ্বশুর জনাব আবদুল বারী চৌধুরীর আবির্ভাব না হলে হয়তো সে এ,কে খানের জন্মই হত না। ইতিমধ্যে তিনি দু'বার আই,সি,এস, পরীক্ষা দেন এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্মাণ ঠিকাদার হিসাবে তিনি ব্যবসায় পদার্পণ করেন এবং শুরুতেই তিনি বেশ সাফল্য লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর এ,কে,খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির গোড়া শুরু করবার জন্য শিল্পে উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে, দেশের শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের কর্মসংস্থানও হবে। তাই তিনি শিল্পের দিকে ঝুকে পড়লেন।

১৯৫২ সালে প্রায় সাড়ে চারলক্ষ টাকা পুঁজি খাটিয়ে তিনি চট্রগ্রামের বালুর ঘাট অঞ্চলে একটি দিয়াশলাই কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এই কারখানার মূল্য আড়াই কোটি টাকার উপরে হবে। এই দিয়াশলাই কারখানার মাধ্যমেই তাঁর শিল্প জগতে পদার্পণ। এর পর একই এলকায় তিনি স্থাপন করেন একটি প্লাইউডের কারখানা যার মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা। একই সময় ঐ সময়কার তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকল্প টেক্সটাইল মিলস-এর কাজ শুরু করেন। পঁচিশ হাজার স্পিণ্ডেল নিয়ে এই কারখানা ১৯৫২ সালেই উৎপাদন শুরু করে। এই কারখানায় তিনি পুঁজি খাটিয়েছিলেন পাঁচ কোটি টাকা।

এ,কে, খান যখন এই দেশে কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত তখন নানা কারণে এই দেশে শিল্প কারখানা স্থাপন করা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় ন্যূনতম কাঁচামাল পর্যন্ত বিদেশ হতে আমদানী করতে হত, টেক্সটাইল মিলের জন্য সুদূর লাহোর হতে লোহার রড আর হায়দ্রাবাদ হতে সিমেন্ট আনতে হয়েছিল।

ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য এ,কে, খানকে পদে পদে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানী ব্যাংক সমূহ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে কখনও এগিয়ে আসেনি। একটি বৃটিশ ব্যাংক যদি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না আসত তাহলে তাঁকে যথেষ্ঠ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত।

এ,কে, খানের নিজস্ব ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার দর্শন রয়েছে। তিনি মনে করেন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য মালিককে নিজেই সকল সময় শিল্প কেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। দুরে বসে শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনা করা যায় একথা এ, কে খান মানতে রাজী নন। তাঁর মতে উৎপাদনের দিকটাই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শিল্পে তিনি মালিক, শ্রমিক সহযোগীতা ও সদ্ভারের প্রতি নির্দ্দেশ প্রকল্প আরোপ করেন।

এ,কে, খান একসময়ে রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৎকালীন জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হন। মুসলিম গীগের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের শিল্প মন্ত্রী ছিলেন। ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি শিল্প নীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি যখন শিল্প মন্ত্রী হন তখন পূর্ব পাকিস্তানেও অবাঙ্গালীরা ব্যাবসার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ছিল। বাঙ্গালী শিল্পপতি যে কয়েকজন ছিলেন তাঁদের হাতে গোনা যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বাঙ্গালীরা তখন অত্যন্ত দূর্বল। যে কয়েকজন বাঙ্গালী শিল্প কারখানা গড়বার জন্য লাইসেন্স পেতে সক্ষম হতেন তাঁরা পুজির অভাবে শিল্প কারখানা না গড়ে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে দিতেন। বাঙ্গালী উদ্যোক্তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি P.I.D.C. কে বিভক্ত করে EPIDC ও WPIDC নামে দুইটি পৃথম সংস্থা গঠন করেন। এই দেশে ব্যবসায় এবং শিল্প ক্ষেত্রে এ, কে, খানের সাহসী এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহনের ফলে অনেক বাঙ্গালী শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসতে সাহস পান। তিনি যখন মন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন, তখন এদেশে বাঙ্গালী মালিকানাধীন জুট মিল ছিল একটি। তাঁর প্রেচেষ্টায় এবং সাহায্যে পরবর্তীকালে এই সংখ্যা তিরিশে দাঁড়ায়। তাঁর সময়েই “কর্ণফুলী রেয়ন মিল” এবং চট্রগ্রাম ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। তাঁর চার বৎসর মন্ত্রীত্বের সময়ে শুধুমাত্র যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কাজ করেছিলেন তা'ই নয়, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বহু কল- কারখানা গড়ে উঠে। তখন এই দেশে বাঙ্গালী মালিকানাধীন কোন ব্যাংক ছিল না। তিনি মন্ত্রী থাকা কালে তৎকালীন কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক তদবির করে বাঙ্গালী মালীকানায় একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি লাভ করেন। এর ফলে এই দেশে বাঙ্গালী মালিকানায় প্রথম ব্যাংক “ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক ----- হল। তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র শিপিং কোম্পানী পাকিস্তান স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী স্থাপন করেন।

এ দেশে প্রথম যে, সাইন্টিফিক কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশনের সভাপতি ছিলেন এ,কে, খান। তিনি আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে কারিগরী শিক্ষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি সাইন্টিফিক কমিশনের সভাপতি হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার জন্য সুপারিশ করেন।

তিনি তাঁর কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতা হতে এইমত পোষণ করেন যে, যদি কেউ সুশৃংখল ভাবে প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে কঠিন শ্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে, তাহলে জীবনে সাফল্য না পাবার কোন কারন থাকে না।

জীবনে সাফল্যের সন্ধান পেতে হলে শৃঙ্খলা, আত্নবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য বলে জনাব খান মনের করেন। তাঁর জীবনে প্রতিটি গুণের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। তিনি খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করেন এবং বর্তমান দুনিয়ার হাল হাকিকত জানার জন্য রেডিও শুনতেন এবং দেশ বিদেশের সংবাদ পত্র পরতেন।

তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতিচারণ করে তিনি তৃপ্তিবোধ করেন। তিনি যা অর্জন করতে পেরেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট। তবে তিনি মনে করেন যে, আজকে এদেশের শিল্পপতিরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তার সিকিভাগও যদি তিনি পেতেন তাহালে তাঁর সাফল্য হত নিশ্চিত গগণচুম্বী ।

জনাব মোহাম্মদ জুনাব আলী

হাজী মোহাম্মদ জুনাব আলী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত নিমসার থানার সিকাপুর নামক এক গ্রামে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ চারু মিয়া ছিলেন একজন শান্ত, নিরীহ এবং ধর্মপরায়ন মানুষ এবং গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ এক কৃষক। জমি জমা বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। সব সময় অন্যের জমি চাষ করতেন। আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে তাঁর সংসার চলত। প্রায়ই সংসার খরচের জন্য নিকটতম আত্মীয় স্বজনদের নিকট হতে আর্থিক সাহায্য নিতেন। শেখ চারু মিয়া ৮২ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালে নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন।

হাজী জুনাব আলী আজ কুমিল্লা জেলার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং ধনীদের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য ধনীলোকের জীবন বৃত্তান্ত হতে তাঁর কর্ম জীবনের কাহিনী একটু ভিন্ন ধরনের। জুনাব আলী নিজ গ্রামের মক্তবে পড়াশুনা করেন। বৎসরান্তে তিনি যখন মক্তবের প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, সেই সময় তিনি তাঁর পিতা শেখ চারু মিয়ার নিকট নতুন বই ক্রয় করার জন্য টাকা চাইলেন। কিন্তু তাঁর টাকা দিতে না পারায় বাড়ীর চাউল, ডাল যা কিছু আছে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ১ টাকা ৫৬ পয়সা পেলেন এবং তা নিয়েই বাড়ী ছাড়লেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে এবং মা বাবার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতে না পারলে কখনও বাড়ী ফিরবেন না। এই ১ টাকা ৫৬ পয়সাই ছিল তাঁর মূলধন এবং এভাবেই তাঁর জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময় তাঁর বয়স ছিল বারো বৎসর। ১ টাকা ৫৬ পয়সা নিয়ে গ্রামের হাটে ঝুড়িতে করে তিনি তরি তরকারী বিক্রয় করতে আরম্ভ করেন। গ্রামের হাট মানেই ছোট একটি খালি জায়গা যার একপাশে কাঁচা বাজার এবং সেখানেই তিনি ঝুড়িতে করে তরিতরকারী বিক্রয় করতেন।

প্রচুর পরিমাণে আনাজ নিয়ে গ্রামের আশে পাশের সাপ্তাহিক বাজার গুলোতে যেতেন। মাঝে মাঝে শহর ও শহরতলীতে যেতেন। এই পেশায় তিনি প্রায় বারো বৎসর নিয়োজিত ছিলেন। এই ব্যবসা হতে তিনি আস্তে আস্তে সঞ্চয় করে তাঁর মূলধন প্রায় তিন হাজার বৃদ্ধি করলেন। এই তিন হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কুমিল্লা শহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে ত্রিপুরা বাজারে (বর্তমানে ময়নামতি) একটি বড় আকারের মনোহারী দোকান দেন। দোকানে দুইজন কর্মচারী ছিল। তবু পরিচালনার কাজ নিয়ে করতেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্দের সময় বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর ঘাঁটি ছিল এই ময়নামতি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সৈনকিদের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে সেনানিবাসে চড়ামূল্যে নিয়মিত (চাউল, ডাল, তৈল, লবন ইত্যাদি) সরবরাহের কন্ট্রাক্ট লাভ করেন এবং তাতে প্রায় পনের-বিশ হাজার টাকা উপার্জন করেন। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে তিনি উপার্জিত টাকা দিয়ে কুমিল্লা শহরের ব্যস্ততম এলাকা শাসনগাছা বাজারে একটি বড় আকারের মনোহরী দোকান দেন। দোকানটি এত বড় ছিল যে, সেখানে প্রত্যহ ৮ জন কর্মচারী নিযুক্ত থাকত। ব্যবসায় চলাকালীন সময়ে তিনি নিজের গ্রামে কিছু কিছু জমি ক্রয় করতে শুরু করেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি নিজ ইউয়িনের প্রেসিডেন্ট ও নিয়োজিত হন। শাসনগাছায় তখন দুইটি মাত্র দোকান ছিল বলে তাঁর ব্যবসায় খুব জমজমাট ছিল। তাছাড়া জুনাব আলী নিজে বিশ্বস্ত ছিলেন বলে পুরানো ঢাকার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা তাঁকে দোকানের মালামাল বাকীতে যোগান দিত। এটা ছিল তাঁর পক্ষে একটি বিরাট আর্থিক সুবিধা। কিছু কাল পরে তিনি দোকান হতে মূলধন উঠিয়ে কুমিল্লা দাউদকান্দি রুটে "সোনার বাংলা" এবং "গ্রীন এ্যারো" নামে ২০,০০০ টাকা মূল্যের দুইটি বাস চালু করেন। বাসের ব্যবসাও খুব ভাল ছিল, কারণ সেই রুটে বাস ছিল মাত্র ৮টি যা যাত্রীদের চাহিদার তুলনায় ছিল খুবই কম।

একই প্রতিষ্ঠানের দুইটি দ্রব্য ক্রয় করলে কন্টন ব্যয় কমে যাবে ভেবে তিনি ১৯৫০ সালে তাঁর শাসনগাছা দোকানের নামে তৎকালীন পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর কুমিল্লা জেলার একমাত্র পরিবেশক হন। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় খুব লাভজনক মনে করে জুনাব আলী এই ব্যবসায়েও মূলধন নিয়োগ করেন এবং প্রায় প্রতি বৎসরই দুই একটি বাস বা ট্রাক ক্রয় করতেন। এ সকল বাসের জন্য ব্যাংক হতে ৩০% ঋণ পাওয়া যায়। এসময়ে তিনি কুমিল্লা শহরের আবাসিক এলাকা অশোকতলায় ও কান্দির পাড়ে দুইটি হিন্দু জমিদারের বাড়ী ক্রয় করেন। ১৯৪৭ সালে অনেক হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়

জুনাব আলী তাঁদের জমি ও স্থাবর সম্পত্তি কিনে সম্পদশালী হয়েছিলেন। জুনাব আলী নিজে রেসকোর্স এলাকায় একটি খালি জায়গা ক্রয় করে বাড়ী করেন ও এ জমিতেই তাঁর ট্রান্সপোর্টের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর বাস ও ট্রাকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭০ টিতে। ঐ ব্যবসায়ে প্রায় ২০০ শ্রমিক কার্যে নিয়োজিত ছিল।

ইতিমোধ্য জুনাব আলী ক্রমশ গ্রামের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, সোহরাওয়ার্দীল নেতুত্বে তৎকালীন কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের তিনি একজন সমর্থক থাকায় জুনাব আলী স্থানীয় প্রতিটি নির্বাচনেই জয়লাভ করতেন এবং প্রায় একটানা ৩০ বৎসর যাবত স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের কখনও মেম্বার কখনও বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই ১৯৫৮ সালে নিজ আবাস হতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে সাত দিন কারাবাস করতে হয়।

জুনাব আলী ১৯৬২ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে একটি আলুর বীজ আমদানীর লাইসেন্স সংগ্রহ করেন। দেশে আলুর ফলন বৃদ্ধির জন্য এ লাইসেন্স-এর সাহায্যে বার্মা, শ্রীলঙ্কা ও হল্যাণ্ড হতে আলুর বীজ আমদানী করে কৃষকদের কাছে বিক্রয় করা হত। এই ব্যবসায় তিনি প্রায় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত করেন এবং এ সময়ে (১৯৭০ সালে) তাঁর মূলধন ছিল প্রায় ২৫/৩০ লাখ টাকা এবং তখনই শিল্প স্থাপনের দিকে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শিল্পের ববসায় সম্পর্কে তাঁর মোটেই কোন ধারণা ছিল না। ১৯৬৮ সালে কুমিল্লার স্থানীয় শিল্প ব্যাংকের (তৎকালীন পকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক) উর্দ্ধতন কর্মকর্তার পরামর্শে এবং ঋণের নিশ্চয়তা পেয়ে তিনি কুমিল্লা শহর হতে বাইশ মাইল দূরবর্তী স্থান কোম্পানীগঞ্জ একটি বস্ত্র কল স্থাপনের ইচ্ছা করেন। বস্ত্র কল স্থাপনের জন্য তিনি কোম্পানীগঞ্জে চল্লিশ বিঘা জমিও ক্রয় করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ১৯৬৮ হইতে ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাদ্য পরিবহন ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। আবার এ সময়ে পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানীর চট্রগ্রাম বিভাগের ঠিকাদারও ছিলেন জুনাব আলী। চট্রগামে থাকাকালীন তিনি ১৯৬৮ সালে ব্যস্ততম বানিজ্যিক এলাাকা আগ্রাবাদে এক বিঘার একটি খালি জায়গা ক্রয় করেন এবং ব্যবসায়িক কাজ কর্মের সুবিধার জন্য সেই জায়গায় একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। ১৯৭০ সালে বার্মা ইষ্টানের এজেন্সি নিয়ে ময়নামতি নামক স্থানে, ঢাকা- চট্রগ্রাম রাস্তার পার্শে পাঁচ বিঘা জমির উপর পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি পেট্রোল পাম্প স্থাপন করেন। এ পাম্প বিভিন্ন সরকারী আধা-সরকারী অফিসের তেল সরবরাহকারী ছিল।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে হাজী জুনাব আলী শহর ছেড়ে নিজ গ্রামে ফিরে যান ও সেখানে এক বৎসর অবস্থান করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁর প্রায় ২০/৩০টি, বাস, ট্রাক ধ্বংস করে। বাকী বাস ও ট্রাক তাঁর কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ বন্ধ রেখে তিনি ঐ সময়ে গ্রামের জমি-জমার দিকে মনোযোগ দেন। ইতিমধ্যে তাঁর চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

যদ্ধের শেষে শহরে এসে জুনাব আলী ট্রান্সর্পোটি ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন। যুদ্ধ শেষে অবশিষ্ট যে কয়টি বাস, ট্রাক হাতে ছিল সেগুলি তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদৈর নিকট কম মূল্যে কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য শর্তে বিক্রয় করে দেন।

১৯৭২ সালে সরকার আলু আমদানী প্রাইভেট সেক্টর হতে তুলে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জুনাব আলী ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে আলু গুদামজাত করার জন্য ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বেতকা নামক স্থানে পঞ্চাশ হাজার মণ আলু রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হিমাগার স্থাপন করেন। লক্ষণীয় যে, জুনাব আলী সুযোগ বুঝে অনেক বারই অক্লেশে নতুন ব্যবসায় বা শিল্পেবিনিয়োগ করেছেন এবং অলাভজনক মনে হলে পুরাতন কাজ ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করেছেন। বেতকা হিমাগার শিল্পে ব্যায় হয় সর্বমোট ২০ লাখ টাকা। ইতিমধ্যে মালিকের নিজস্ব বিনিয়োগ ৬ লাখ বাকী টাকা ব্যাংক হতে ঋণ হিসাবে নিয়ে ছিলেন। এই শিল্পে প্রায় পঁচিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে। একই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর জীবনে নেমে আসে এক মহা বিপদ। ব্যবসায়িক কাজে তিনি চট্রগাম গিয়েছিলেন এবং সেখান হতে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারীরা পত্র মারফত তার নিকটতম আত্নীয় স্বজনকে জানায়। অন্যথায় প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার চাপে তিন দিন পর তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

১৯৭৪ সালে জুনাব আলী আবার মুন্সীগঞ্জ কমলাঘাট নাম স্থানে “প্রেজেক্ট” ট্রেডিং কোল্ড ষ্টোরোজ লিমিটেড-এর শতকরা ষাট ভাগ শেয়ার ক্রয় করেন এবং নগদ দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। এখানে প্রায় পঁচিশ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। ১৯৭৬ সালে জনাব আলী কুমিল্লা শহর হতে দুই মাইল দক্ষিন পূর্ব কোণে শাম্‌স লোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ এর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শেয়ার ১৮ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ ক্রয় করেন। এখানে বিশ জন শ্রমিক নিয়োজিত আছে।

১৯৭৮ সালে আবার ব্যাংকের সহায়তায় মুন্সীগঞ্জের বেতকায় জামাল আইস এ্যাড কোল্ড ষ্টেরেজ লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের ৩৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয় এর দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ জনুব আলীর নিজেস্ব ছিল। একানে ও ২০/২৫ জন শ্রমিক কর্মস্থান আছে।

১৯৮০ সালে কুমিল্লা শহর হতে প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে মোকাস নামম স্থানে এক লক্ষ মণ আলু রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন "মোকাস কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ" নামে জুনাব আলী আর একটি হিমাগার প্রতিষ্ঠা করেন। একানে তার নিজস্ব প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। বাকী টাকা ব্যাংকের বিভিন্ন খাত হতে আসে এখানেও প্রায় ৪০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়।

এই সব হিমাগার স্থাপনের মাধ্যমেই আসে তাঁর প্রধান ব্যবসায়িক সাফল্য। প্রতিবারই তিনি হিমাগারে মোট রক্ষিত মালের শতকরা ২৫ ভাগ নিজেই কৃষকদের নিকট হতে ক্রয় করে মজুদ রাখেন। আর বাকী মাল রাখবার জন্য তাঁদের নিকট ভাড়া দেন। বাংলাদেশের হিমাগার একটি লাভজনক ব্যবসায় হয়ে ওঠে।

১৯৭৮ সালে কুমিল্লা শহরের সাত মাইল পশ্চিমে কাবিলা নামক স্থান জুনাব আলী একটি ব্রিকফিল্ডও স্থাপন করেন। ব্রিকফিল্ডের ইট তাঁর নিজেই নির্মাণ কাজেই প্রধাণত: ব্যবহার করা হয়।

১৯৬২ সালে ঢাকার মালিবাগে পাঁচ কাঠার একটি জায়গা ক্রয় করে জুনাব আলী সেখানে একটি দোতলা বাড়ী নির্মান করেন।

মালিবাগ ডি, আই,টি, রোডের পাশ্বে আট কাঠার আর একটি জায়গা ক্রয় করে সেখানে 'স' মিল স্থাপন করে কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। এখানে ১৫ জন লোক নিয়মিত কাজ করে। ১৯৭৫ সালে তিনি চার কাঠার আর এক খণ্ড জমি ঢাকা শহরের খিলগাঁয়ে ক্রয় করেন।

জুনাব আলী লেখাপড়ার সুযোগ না পাওয়ায় ১২ বৎসর বয়সে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো এবং জমি বাড়ী ইত্যাদি মিলিয়ে তার মূলধনের পরিমান দুই কোটি টাকার বেশী। এখনও তিনি একটি কাপড়ের কল ও একটি রি-রোলিং মিল স্থাপনের ইচ্ছা পোষন করেন। তাঁর এত অর্থ ও যশ থাকা সত্বেও তিনি মনে করেন একটি বিরাট অর্থবহ জিনিষ নেই এবং তা হল বিদ্যা। তাই তিনি মানুষ যাতে বিদ্যার্জন করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সময়ে স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করেন। তাঁর অর্থেই নিজ গ্রামের নিমসার হাইস্কুল ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ঐ স্কুলের পাশেই ১৯৭২ সালে ৩০ বিঘা জমির উপর "জুনাব আলী কলেজ" নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই কলেজটির ব্যয় ভার তিনি নিজেই বহন করেন। নিজেই গ্রামে ৫০ জন এতিম ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা ও বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ট্রাষ্ট হতে এসকল প্রতিষ্ঠানে টাকা দান করা হয়।

কর্মময় জীবনের শুরু হতেই জুনাব আলী একজন পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী ও ধর্মপরায়ণ মানুষ রূপে পরিচিত। তাঁর মিতব্যয়িতা ও সরল জীবন যাপন সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, যখন নিজেই কোম্পানীর বাসে চড়ে তিনি কোথায়ও যেতেন, যেন একটি সাধারণ সিটের ভাড়াও নষ্ট না হয় সেজন্য তখন তিনি ড্রাইভারে পাশে বসতেন। হাতে একটি ফোলিও জীর্ণ ব্যাগ সহ জুনাব আলীকে সব সময় স্যাণ্ডেল ও লুঙ্গি, পাঞ্জাবী পরিহিত দেখা যায়। বিলাস বহুল জীবন তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি নিজেই এত গাড়ী থাকা সত্ত্বেও তৈল খরচ হবে মনে করে কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা ব্যবহার করতেন না। সকল সময়ে বাসে যাতায়াত করতেন এবং যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় সেখানে পায়ে হেঁটেই যান।

মিলামেশায় তিনি খুব সামাজিক। নিজেই শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি প্রয়োজনবোদে খাওয়া- দাওয়া করেন। এতে তিনি কোন লজ্জাই অনুভব করেন না। পারিবারিক জীবনেও তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চার ছেলে ও ছয় মেয়ে। বড় ছেলে নূরুল ইসলাম গ্রাজুয়েট, দ্বিতীয় ছেলে রফিকুল ইসলাম, এম,এ ক্লাশের ছাত্র। বাকীরা অধ্যয়ন রত।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখা শুনার জন্য জ্যোষ্ঠ পুত্র নূরুল ইসলাম পিতাকে সাহায্য করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। প্রত্যেহ অতি ভোরে তিনি ঘুম হতে উঠেন, অনেক রাত্রে ঘুমাতে যান। বাড়ীতে কুব কম সময় তাঁকে পাওয়া যায়। সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকেন। ষাটের উপরে বয়স হলেও এখনও তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও নতুন ব্যবসায়ে নামবার অটুট আগ্রহ রয়েছে।

জনাব গুলবক্স ভূঁইয়া

সততা, কঠোর পরিশ্রম ও ব্যবসায়িক বৃদ্ধির বলে আমাদের দেশের যে কয়জন শিল্পোদ্যোগী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন হাজী গুলবক্স তাঁদের অন্যতম। ১৯১৩ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রূপগঞ্জ থানায় মুর্তজাবাদ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর পিতার নাম এলাহি বক্স ভূইয়া ও মাতার নাম টুকি বিবি। এলাহি বক্স ভূইয়া ছিলেন একজন সাধারণ কৃষক। কৃষিকাযের ফাঁকে বর্ষা মৌসুমে তিনি ভাইদের সাথে মিলে পাটের কারবার করতেন। আশেপাশের দুই তিনটি থানার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে পাট ক্রয় করতেন। সে পাট তিনি নরায়নগঞ্জ শহরে বিক্রয় করতেন।

গুলবক্স ভঁইয়া তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা পরলোকগমন করেন। তখন হতে তিনি নানীর স্নেহে আদরে মানুষ হতে থাকেন। তৎার নানী ছিলেন ধর্মপরায়ন মহিলা। পরবর্তী জীবনে গুলবক্স ভুইয়ার উপর তাঁর নানীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মাতার মৃত্যুর পর পিতা তাঁর খালাকে বিবাহ করেন। এক কন্যা সন্তান প্রসবের পর তিনি মারা যান। এলাহি বক্স ভুইয়া তৃতীয়বার বিবাহ করেন। এ ঘরে তাঁহার চার ছেলে ও চার মেয়ে।

গুলবক্স ভুইয়া পার্শ্ববর্তী মুড়াপাড়া হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি লক্ষ্য করেন যে তার গ্রামের প্রায় সকলের ঘরেই তাঁত আছে। কিন্তু দূরের নারায়নগঞ্জ শহর হতে তাদেরকে সূতা সংগ্রহ করতে হয়। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর তখন তিনি নিজ উদ্যোগে পিতার অজ্ঞাতে সূতার ব্যবসায় শুরু করেন। খুব অল্প পুঁজি নিয়ে তিনি কারবার শুরু করেন। নিজ বাড়িতে তিনি চার বছর ব্যবসায় করার পর তিনি স্থানীয় বূলতা বাজারে একটি দোকানের ব্যবস্থা করেন। এ সময়ে তিনি নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন মহাজনের নিকট হতে সূতা সংগ্রহ করতেন। তখন প্রধানত কলিকাতা হতে সূতা আসত। তাছাড়া ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলস হতেও সূতার কিছু সরবরাহ পেতেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে অব্যস্ত ছিলেন। এ সময় তিনি নিজেই কাঁদে করে বিভিন্ন হাটে সূতা বহন করতেন। গুলবক্স ভুইয়া মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। কখনও কথার বরখেলাপ করতেন না। ফলে নারায়নগঞ্জের সূতার মহাজনেরা তাঁর নিকট ধারে মাল বিক্রয় করতে রাজি থাকত।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৩ সালে গুলবক্স ভুইয়া পার্শ্ববর্তী মুড়াপাড়া বাজারে খাদ্যদ্রব্যের ডিলার মনোনীত হন। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরবর্তী বছর তিনি সূতার সরকারী ডিলার নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত তিনি মুড়াপাড়া বাজারে একটা ভাড়া করা দোকানে কাজ চালিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নারায়নগঞ্জে সর্বপ্রথম সূতার দোকান খুললেন। তার সততা ও সুনামের জন্য পূর্ব হতেই নারায়নগঞ্জের সূতার পাইকারী মহাজনেরা তাঁকে বাকিতে সূতা দিয়ে সাহায্য করতেন। সূতার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। তাঁদের নিকট হতে তিনি ব্যবসায় সম্পর্কে সরাসরি পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। ১৯৫৩ সালে তিনি সূতার হোলসেল ডিলার নিযুক্ত এ সময়ে নরসিংদী, মাধবদী, বাবুরহাট, শাহজাতপুর, পাবনা, কাঙ্গাইল প্রভৃতি এলাকার সূতা ব্যবসায়ীগণ তাঁর নিকট হতে সূতা ক্রয় করত। ব্যবসায় তাঁর সততার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা জানা যায়। ১৯৫৩ সালে কথা। গুলবক্স ভুইয়া নারায়নগঞ্জের আরব লিমিটেডের নিকট হতে কুড়ি বেল সিঙ্গাল সুতা কিনেন। তখনকার দিনে এর আনুমানিক মূল্য ছিল ষোল হাজার টাকা। মুড়াপাড়ার দোকানে নিয়ে তখণ তিনি সূতার বেল খুললেন দেখতে পেলেন যে সকল গাইটে সিঙ্গল-এর পরিবর্তে ডাবল সূতা রয়েছে। তিনি তার লোকজনদের সূতা বিক্রয় বন্ধ রাখতে বললেন। নারায়নগঞ্জের মাহজনের নিকট তিনি ব্যাপারটি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাদের কাগজপত্র সিঙ্গাল সুতা হিসেব এর উল্লেখ ছিল। এ সুতা তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান হতে আমদানি করা হয়েছিল বিধায় সেখানকার রাপ্তানিকারকে বিষয়টি অবহিত করা হল। তাঁদের কাগজপত্রেও সিঙ্গাল সূতা হিসেবে এর বর্ণনা ছিল। এই পমিাণ ডাবল সূতার তখনকার বাজারদর ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। একজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর এ সততায় পশ্চিম পাকিস্তানের বড় ব্যবসায়ীরা মুদ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হন এবং যে কোন পরিমাণ সূতা তিনি তাদের নিকট হতে ধারে ক্রয় করতে পারতেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে কলকারখানা স্থাপন করেছেন।, সেখানেও তাদের সক্রিয় পরামর্শ ও সহযোগীতা তিনি পয়েছেন।

গুলবক্স ভূইয়া ১৯৩৩ সালে ২০বছর বয়সে আড়াইহাজার থানার উৎরাপুরই নিবাসী আইছালী প্রধানের কন্যা শহিতুন্নেসাকে বিবাহ করেন। তাঁর ছয়টি পুত্র ও চারটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বড় ছেলে মজিবর রহমান ভূইয়া সকল সময়েই তৎার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছেন। ছেলেদের সকলেই দেশে থেকে পড়াশুনা করেছেন ও পারিবারিক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আছেন। ছেলেদের সকলেই দেশে থেকে পড়াশুনা করেছেন ও পারিবারিক ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত আছেন।

গুলবক্স ভূইয়া দীর্ঘদিন ধরে দেখে এসেছিলেন যে, মুড়াপাড়া এলাকায় তাঁতীরা যে কাপড় তৈরি করে, তা ইস্ত্রিকরার মত কোন প্ল্যান্ট অত্র এলাকায় নেই। ব্যবসায়ীক বুদ্ধিসম্পন্ন গুলবক্স ভুইয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মুড়াপাড়ায় একটি ক্যালেন্ডারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। দশ-বার জন শ্রমিক নিয়ে তিনি এ কাজ শুরু করেন।

মুড়াপাড়ার জমিদার তারক নাথ ব্যানার্জীর পরিবার যখন দেশ বিভাগের সময় কলিকাতা চলে যান, তখন তাদের গাড়ি গুলবক্স ভূইয়ার হাতে তুলে দিয়ে যান। জমিদার বাড়ির লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস ও সমীহ করত। সে বাড়ি সংলগ্ন উঠানে ১৯৫৯ সালে তিনি গাউসিয়া কটন স্পিনিং মিলস লিমিটেড স্থাপন করেন। এ সমস্যা শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়া যেত। গুলবক্স ভুইয়া নিজ এ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং পরিবারের জন্য দয়স্যগ এর ডাইরেক্টর ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি জাপান হতে ১২,৫০০ তাঁত আমদানি করেন। ১৯৬১ সালে এর সাথে ১৭৫টি লুম যোগ করা হয়। তখন এ মিলে প্রায় সাত শত শ্রমিক কাজ করত। এ মিলে মার্কিন ও শাড়ী কাপড়সহ দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার পাউন্ড সূতা উৎপাদিত হতো।

এ পর্যায়ে গুলবক্স ভূঁইয়ার ব্যবসায় বিপুলভাবে বেড়ে যায়। পরবর্তী ছয় সাত বছরে তিনি আরও তিনটি মিলের মালিক হন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী মিল মালিকদের মধ্যে পাইওনিয়াম। ১৯৬৫ সালে তিনি গাউসিয়া কটন মিলের পাশে ২৫০টি তাঁত সম্বলিত গাউসিয়া জুট মিল স্থাপন করেন। এটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। হাজী সাহেবের অংশ ছিল শতকরা চল্লিশ ভাগ বাকি ষাট শতাংশ পিকিক (PICIC) যোগান দেয়। তিনি যুক্তরাজ্য হতে এ মিলের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। এ মিলে তখন প্রায় বারশত জন্য শ্রমিক কর্মসংস্থান হয়।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় হতে ইপিআইডিস অনেকগুলো মিল কারখানা হতে পুঁজি প্রত্যাহার শুরু করে। গুলবক্স ভূঁইয়া ১৯৪৮-৬০ সাল পর্যন্ত মুড়াপাড়ার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে সুবাদে তদানীন্তন প্রাদেশিক গভর্নরের সাথে তাঁর ভাল জানাশুনা ছিল। ১৯৬৮ সালে দেড়কোটি টাকায় ইপআইডিসি'র নিকট হতে কালিগঞ্জ মুসলিম কটন মিলস লিমিটেড ক্রয় করেন। এতে গুলবক্স ভূঁইয়ার শেয়ার ছিল ষাট লাখ টাকার। মিলে ৫,০০০ টাকু ও ৭৫০টি তাঁত ছিল। এ মিলে প্রিন্টিং পললিন, শার্টের কাপড় , শাড়ী ও সূতা প্রস্তুত করা হতো। প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক এ মিলে কাজ করতঃ। একই বছর তিনি ডেমরাতে আহমদ সিল্ক মিলস লিমিটেড ক্রয় করেন। এর মূলধনের পরিমাণ ছিল পনের লক্ষ টাকা ও প্রায় দুই শত জন শ্রমিক এ মিলে কাজ করত। এ মিলে নাইলন ও পলিষ্টারের কাপড় তৈরি হতো।

গুলবক্স ভূঁইয়ার অনেক সামাজিক সংস্থার সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি এক সময়ে নারায়ণগঞ্জ সূতা ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পিতার নাে হাজী এলাহী বক্স দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্ব্যতীত মুতজাবাদ দারুল উলুম মাদ্রাসারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ব্যাবসায়ের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৮ সালে তিনি তমঘায়ে পাকিস্তান খেতাবে ভূমিকা হন। হাজী গুলবক্স ভুঁইয়া ব্যাক্তিগত জীবনে সদালাপী ছিলেন। সকল সময় কোর্ট কাচারী এড়িয়ে চলতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরতেন ও যাকাত দিতেন। জাতীয়করণের আগে গুলবক্স ভূঁইয়ার মালিকানায় যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলোতে তাঁর নিজস্ব বিনিয়োগ চার পাঁচ কোটি টাকা হবে বলে মনে হয়। তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি প্রায়ই পাজামা ফুল শার্ট ও টুপি পরতেন। কঠোর পরিশ্রমী এ মানুষটি সাদা ভাতের সাথে কই, মাগুর এবং সোল মাছ খেতে পছন্দ করতেন। খুব প্রস্যুষে নামাজের পর ঘন্টাখানেক প্রাতঃভ্রমণ করতেন। সকাল আটটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে দোকানে যেতেন।। গভীর রাত অবদি কাজ করতেন। জানা যায় যে, হিসাব না মিলিয়ে তিনি কখনও ঘরে ফিরতেন না। অবসর সময়ে তিনি ঢাকার বড়কাটরার পীরজী হুজুরের নিকট যাহায়াত করতেন। ১৯৭১সালে তিনি পাকিস্তানে ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফিরেন। দেশে ফিরার পর তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। দেশে চিকিৎসা করার পর তাঁকে লন্ডনেও চিকিৎসা করানো হয়। ১৯৭৫ সালে ১৭ জুলাই এ সফল শিল্পপতি ৬২ বছর বয়সে তাঁর নারায়ণগঞ্জে নিজস্ব বাড়িতে পরলোকগমন করেন।

পাঠ সংক্ষেপ

কয়েজন সফল উদ্যোক্তার মধ্যে জনাব আবুল কাশেম খান, জনাব মুহাম্মদ জুনাব আলী, গুলবক্সের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জনাব মুহাম্মদ জুনাব আলীর ব্যবসায়ী জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করুন।

২. জনাব আবুল কাশেমের জীবনীর উদ্দেখযোগ

নমুনা প্রশ্ন

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

কোর্স কোড : BBS 3506

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৮০

(দ্রষ্টব্য : ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক)

ক-বিভাগ : বড় প্রশ্ন : (যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন) **মান ১২×৫=৬০**

১। শিল্পোদ্যোগ বলতে কি বোঝেন? শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

২। শিল্পোদ্যোগীয় পরিবেশ কাকে বলে? ব্যবসায়িক পরিবেশের অর্থনৈতিক ও আইনগত দিক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

৩। শিল্পনীতি ২০০৫ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। ২০০৫ সনের নীতি কৌশল বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৫+৭=১২

৪। প্রেষণার সংজ্ঞা দিন। বিভিন্ন প্রকার আর্থিক ও অনার্থিক প্ররোচক বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

৫। SWOT বিশ্লেষণ কি? SWOT বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৬। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৭। প্রকল্প বলতে কি বোঝেন? প্রকল্পের কৌশলগত বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যাখ্যা করুন। ৩+৯=১২

৮। ব্যবসায় পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিন। ব্যবসায় পরিকল্পনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩+৯=১২

খ-বিভাগ : ছোট প্রশ্ন (যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন) **মান ৪×৫=২০**

৯। শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে? ৪

১০। শিল্পোদ্যোগের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সমূহ উল্লেখ করুন। ৪

১১। শিল্পায়নে মহিলা উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বিকাশ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৪

১২। প্রেষণা চক্রটি বর্ণনা করুন। ৪

১৩। মূল্যবোধ তত্বটিতে কি বলা হয়েছে? ৪

১৪। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার বর্ণনা দিন। ৪

১৫। উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন। ৪

১৬। কেস্ স্টাডির উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখ করুন। ৪

গ্রন্থপঞ্জী

১. শিল্পোদ্যোগ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা- মোঃ মোশাররফ হোসেন, বেদার উদ্দিন আহমেদ, আতাউর রহমান।
২. ব্যবস্থাপনা- ড. আব্দুল আউয়াল খান ও আবু বকর সিদ্দীক।
৩. কারবারের ব্যবস্থাপনা- দূর্গাদাস ভট্টাচার্য।
৪. Entrepreneurship Development- Prof. Dr. Nazrul Islam
৫. কর্মী ব্যবস্থাপনা- প্রফেসর এম ওমর আলী।
৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা- প্রফেসর. ড. নাসিম আনজুম।
৭. Entrepreneurship Development- Prof. Dr. Md. Ataur Rahaman
৮. Entrepreneurship Development- Brain Debson.
৯. Entrepreneurship Development System- W.K. Kellogg.
১০. Entrepreneurship and Small Business Development- Northeast Mississipi Daily Journal.